মেনে নিন তিনি পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। জাহাজের যেমন নোঙর, সংসারে মহিলার ভূমিকাও ঠিক সেটাই। আধুনিক যুগে তিনি সামলাচ্ছেন ঘর ও বাকি দুনিয়া। তাঁর স্বাস্থ্যে থাক অগ্রাধিকার

যত্ন নিন গর্ভধারণের আগেই

ডাঃ সুজাতা দত্ত

প্রেগন্যান্সি একজন নারীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে একটি মেয়ের শরীরে বেড়ে ওঠে নতুন একটি জীবন। তাই মা ও শিশুর সুস্থতার জন্য গর্ভাবস্থার প্রতিটি ধাপে সঠিক যত্ন ও সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। তবে প্রেগন্যান্সি কেয়ার মানে শুধু চিকিৎসা নয়। সঠিক খাবার, নিয়মিত পরীক্ষা, অনেকটা যত্ন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন— সব মিলিয়েই তৈরি হয় নিরাপদ মাতৃত্বের পথ।

শুরুতেই সতর্ক হোন

মনে রাখবেন, প্রেগন্যান্সি কেয়ারের প্রথম ধাপ শুরু হয় গর্ভধারণের আগেই। এই সময়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়, কারণ ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশের অনেকটাই নির্ভর করে মায়ের শারীরিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার ওপর। তাই গর্ভধারণের পরিকল্পনা করার অন্তত এক–দু'মাস আগে থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। কী করবেন?

▼ প্রেগন্যান্সি প্ল্যান করার সময়ে প্রথমেই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এই সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট খাওয়া শুরু করা খুবই জরুরি। ফলিক অ্যাসিড ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এর অভাবে কখনও কখনও নিউরাল টিউব ডিফেক্ট নামক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেখানে শিশুর মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কের একটি অংশ ঠিক ভাবে বিকশিত হয় না। তাই গর্ভধারণের আগেই ফলিক অ্যাসিড খাওয়া শুরু করলে এই ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়

▼ এছাড়াও অনেক মহিলার আগে থেকেই কিছু শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা অন্য কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগে অনেকেই বিভিন্ন ওষুধ খেয়ে থাকেন। কিন্তু সব ওষুধই গর্ভাবস্থায় নিরাপদ নয়। তাই গর্ভধারণের আগে চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ পরিবর্তন করে দিতে পারেন

▼ এই সময়ে কিছু ভ্যাকসিনেশন নেওয়াও জরুরি। যেমন— যাঁদের ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল, অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁদের রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। তবে এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পর অন্তত চার সপ্তাহ গর্ভধারণের চেষ্টা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এই সময়ে গর্ভধারণ হলে ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে

▼ গর্ভধারণের আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, বাবা বা মা কেউ থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার কি না। যদি বাবা-মা দু'জনেই ক্যারিয়ার হন, তা হলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই আগে থেকেই এই পরীক্ষা করলে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়

▼ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম করা— এই অভ্যাসগুলো গর্ভধারণের জন্য শরীরকে প্রস্তুত করে।

গর্ভধারণের পর করণীয়

প্রেগন্যান্সি টেস্ট পজিটিভ হওয়ার পর প্রথমেই একটি আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়। এর মাধ্যমে দেখা হয়, গর্ভস্থ ভ্রূণটি জরায়ুর ঠিক জায়গায় রয়েছে কি না। কখনও কখনও ভ্রূণ জরায়ুর বাইরে, বিশেষত, ফ্যালোপিয়ান টিউবে তৈরি হতে পারে। যাকে একটোপিক প্রেগন্যান্সি বলা হয়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই শুরুতেই স্ক্যান করে বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। এই স্ক্যানের মাধ্যমে ভ্রূণের হার্টবিট আছে কি না এবং গর্ভাবস্থা স্বাভাবিক ভাবে এগোচ্ছে কি না, তাও জানা যায়। এরপর

(এর পর ১৪ পাতায়)

(১২ পাতার পর)

কিছু প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়, যেমন— হিমোগ্লোবিন, থাইরয়েড, ব্লাড গ্রুপ ইত্যাদি। চিকিৎসক প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত ওষুধ বা সাপ্লিমেন্টও দিতে পারেন। সাধারণত গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস পর্যন্ত ফলিক অ্যাসিড চালিয়ে যেতে বলা হয়।

বাচ্চার পর্যবেক্ষণ জরুরি

গর্ভাবস্থার প্রায় তিন মাস পর পরবর্তী স্ক্রিনিং করে দেখা হয় ভ্রূণের কোনও ক্রোমোজোমাল বা জেনেটিক ত্রুটি (যেমন— ডাউন সিনড্রোম ইত্যাদি) আছে কি না। এই স্ক্রিনিংয়ের অংশ হিসেবে একটি বিশেষ আলট্রাসাউন্ড করা হয়, যাকে এনটি স্ক্যান বলা হয়। এর পাশাপাশি মায়ের কিছু রক্ত পরীক্ষাও করা হয়। যদি পরীক্ষায় গুরুতর কোনও সমস্যা ধরা পড়ে, তা হলে চিকিৎসক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ দেন। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে গর্ভাবস্থা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

গর্ভাবস্থার পরবর্তী পর্যায়

গর্ভাবস্থার ১৫-১৬ সপ্তাহ থেকে ডাক্তারের চেম্বারে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন শোনা যায়। এরপর প্রায় ২০ সপ্তাহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করা হয়, যাকে ডিটেইলড অ্যানাটমি স্ক্যান বলা হয়। এই স্ক্যানে ভ্রূণের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, মেরুদণ্ড এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক ভাবে গঠিত হয়েছে কি না, তা বিস্তারিত দেখা হয়। এছাড়াও মায়ের হিমোগ্লোবিন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ইত্যাদি কিছু নিয়মিত পরীক্ষা চলতে থাকে। ৩২ সপ্তাহে গ্রোথ স্ক্যান করে ভ্রূণের বৃদ্ধি দেখা হয়।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যত্ন একান্ত প্রয়োজন। তাই সাধারণত গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে মাসে একবার করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া হয়। ২৮ সপ্তাহের পর থেকে মাসে দু'বার এবং ৩৬ সপ্তাহের পর থেকে প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন হয়, ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত। যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, যেমন— হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, কিডনির সমস্যা বা অন্য কোনও জটিলতা, তা হলে সেই অনুযায়ী বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হয়।

খেয়াল রাখুন

- গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি বাড়িতে রান্না করা খাবার সাধারণত বেশ সুষম ও পুষ্টিকর হয়, তাই বাড়ির তৈরি টাটকা খাবার খাওয়াই সবচেয়ে ভাল। ভাত, ডাল, সবজি, মাছ, ফলমূল ইত্যাদি মিলিয়ে একটি ব্যালান্সড ডায়েট যথেষ্ট
- বাসি খাবার বা বাইরের খাবার না খাওয়াই উচিত। এগুলো অনেক সময় সংক্রমণ বা পেটের সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রেগন্যান্সির সময় আমরা এমনিতেই বেশি ওষুধ দিতে চাই না, কারণ অপ্রয়োজনীয় ওষুধ শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে
- মা এবং শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও শরীরের কোষ গঠনের জন্য প্রোটিন অত্যন্ত প্রয়োজন। যাঁরা নিরামিষভোজী, তাঁরা ডাল, ছোলা, সয়াবিন ইত্যাদি থেকে প্রোটিন পেতে পারেন। আমিষভোজীরা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি থেকে সহজেই প্রোটিন পেয়ে যান
- গর্ভাবস্থায় শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা জরুরি। প্রতিদিন প্রায় আড়াই থেকে তিন লিটার জল খেতে হবে
- অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট ও মিষ্টি জাতীয় খাবার না খাওয়াই ভাল
- ধূমপান ও অ্যালকোহল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
- অনেকে মনে করেন প্রেগন্যান্ট হলেই সম্পূর্ণ বেড রেস্ট নেওয়া উচিত। কিন্তু তা সবসময় প্রয়োজন হয় না। বরং সারাক্ষণ শুয়ে থাকলে শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার মতো সমস্যা হতে পারে। স্বাভাবিক হাঁটাচলা, হালকা কাজকর্ম ও সহজ ব্যায়াম গর্ভাবস্থায় শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

আসলে প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার শারীরিক পরিস্থিতি এক নয়। তাই কোনও সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং শরীর যতটা অনুমতি দেয়, ততটাই কাজ বা ব্যায়াম করুন। সচেতনতা ও যত্নই পারে একটি নতুন জীবনের আগমনকে আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে তুলতে।

ইনপুট: **প্রদীপ্তা ঘোষ**

ডাঃ সুজাতা দত্ত
স্পেশ্যালিস্ট ইন ল্যাপারোস্কোপিক অ্যান্ড রোবোটিক সার্জারি অ্যান্ড হাই রিস্ক প্রেগন্যান্সি
www.gynaecarekolkata.com